आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI
उपाचार्य
प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI
(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)
संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर
FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.वीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail : vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No.________________ दिनांक/Date.________________

নবম বার্তালাপ

আমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশে—

১৫ আগস্ট ২০২০

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিল এই প্রতিষ্ঠানের একটি বিশ্বগত স্বীকৃতি থাকবে এবং বিশ্বজনীন প্রাসঙ্গিকতাও থাকবে। এটা খুব পরিতাপের বিষয় যে গুরুদেবের স্বপ্নকে সার্থক করার পরিবর্তে, প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মঙ্গল ভাবনার প্রশ্নে আন্তরিকতাহীন নিরুৎসুক স্থানীয় স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীর (প্রায়শই যা রীতিমতো দুষ্টচক্র!) স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে আমরা বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য ও তার সম্ভাবনাকে খাটোই করেছি। যখনই আমরা তাদের স্বার্থ-বিরোধী কোনও পদক্ষেপ করেছি তখনই তারা আমাদের প্রশাসনিক প্রয়াসের ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা এবং ঘটনার সাংঘাতিকরকম বিকৃতি রটনা করতে থাকে। খোলা ময়দানে ইচ্ছাসুখে খেলে বেড়াবার জন্য ওই স্থানীয় অভিসন্ধি-পরায়ণ লোকগুলো বিশ্বভারতীর উন্মুক্ত পাখনাগুলোই যেন ছেঁটে দিয়েছে!

বিশ্বভারতীর ভাবমূর্তি

বিশ্বভারতীতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিচ্ছা ব্যক্ত করে বাইরের মানুষ যা বলে থাকেন তা হচ্ছে এখানে অকারণে অপদস্থ হওয়ার ভয় আছে— যা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়! দেশের অন্যত্র থাকেন

এমন দু-তিনজন যোগ্য ব্যক্তিকে এখানকার কর্মসচিব এবং বিত্তাধিকারী পদে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাতে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতায় যা দেখেছি তাতে কথাটার মধ্যে সারবত্তা আছে বলেই মনে হয়। তাছাড়া, অন্যত্র ভাল কাজের সুযোগ পাওয়ার আশায় অনেক উত্তম গবেষক বিশ্বভারতীকে উপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যও এখানে যোগ দিয়ে থাকেন। কথাটা অবশ্যই সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আসা অনেক ভাল গবেষক এখানে এসে থেকে গেছেন এবং বিশ্বভারতীর মানমর্যাদা ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট কাজও করে গেছেন। দুঃখজনকভাবে তাঁদের সংখ্যা দ্রুত কমে গিয়েছে। এর অন্যতম একটি কারণ অবশ্যই বিশ্বভারতীর দুষ্টচক্র-পরিবৃত ভাবমূর্তি;— পদমর্যাদা নির্বিশেষে ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতির ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে। যাঁরা সত্যিই ওইসব দুষ্টচক্রের হাতে বিড়ম্বিত হন বা হয়েছেন তাঁরা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে জেনেও তার প্রতিকার না করে নিজের পিঠ বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। স্বার্থান্ধদের এই কায়েমি ছক যদি প্রশ্রয় পায়; তাহলে আজ হোক বা কাল, সবার উপরেই তার বিরূপ প্রভাব পড়বে। এইরকমই তো কিছু হওয়ার ছিল: যেখানে পূর্বতন একজন উপাচার্যের সামনে বিশ্বভারতীর আধিকারিকদের শারীরিকভাবে হেনস্থা করার পরও;— সম্ভবত সেই বহুশ্রুত 'ভীতি'-র কারণেই পুলিশের কাছে অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করা হয় না! এই 'ভীতির আবহ' ক্যাম্পাসে কায়েম হয়েছে মূলত বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পলায়নী মনোবৃত্তির কারণেই। যাঁরা সেসময় সুবিধাজনক কারণে নির্বিকার ছিলেন তাঁরাও এইসব ঘটে-চলা কুকর্মের দায় অস্বীকার করতে পারবেন না; কারণ প্রকারান্তরে দুষ্কৃতীদের মাথা গলানোর সুযোগ তাঁরাও করে দিয়েছিলেন।

এটা ঠিক যে তখন আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী ছিল যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার কারণেই হোক, কিংবা অন্যের উপর অন্যায়ভাবে কুকথা বলা, শারীরিক হেনস্থা করার প্রতিভার কারণেই হোক;— বিরুদ্ধপক্ষীয়দের উপর ছড়ি ঘোরাতে ছিল যথেষ্টই ওস্তাদ! বিশ্ববিদ্যালয় তখন যা ছিল তা এককথায় একটা রণক্ষেত্র! আমি সেই গুণ্ডামির কিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছি ২০১৯-এর মে মাসে; যেদিন সপ্তম বেতন কমিশনের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমার কথা আদায় করতে দুশোর বেশি শিক্ষাকর্মী রীতিমতো পেশি আস্ফালন করতে করতে পৌঁছে গিয়েছিল উপাচার্যের 'পূর্বিতা' বাড়িতে। আমার মহিলা সহকর্মী প্রফেসর আশা মুখার্জিকে পর্যন্ত তারা ছাড়ান দেয়নি শুধু তাই নয়; বরং তাদের নেতাদের সামনেই তারা তাঁকে সবরকমভাবে অপদস্থ করে। এই একটা ঘটনাই এটা প্রমাণ করবার জন্য যথেষ্ট যে যারা 'রাবীন্দ্রিক' বলে নিজেদের দাবি করে থাকে তারা আর যাই হোক 'রাবন্দ্রিক' হতে পারে না কখনওই। প্রফেসর আশা মুখার্জি, প্রফেসর ভিসি ঝা এবং আমার উপর বর্ষিত তাদের মুখের ভাষা ও শরীরী ভাষা প্রমাণ করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবিটা তারা ব্যবহার করে শুধু বাইরের একটা খোলসের মতো। ওই দুশো শিক্ষাকর্মী ভেবেছিল হম্বিতম্বি করে, ভয় দেখিয়ে, জনবল সাবুদ করে পুরনো ছকে এই উপাচার্যকেও বাগে আনা যাবে! যখন শূন্য হাতে ফিরে যেতে হল তাদের, তখন তারা আবার কী করে উপাচার্যকে হেনস্থা করা যায় তার নতুন ছক কষতে শলা-পরামর্শ শুরু করল। ১৯ অক্টোবর ২০১৯ ঘটল অনুরূপ আরেকটা ঘটনা। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বকলমাধারী প্রশাসক গোষ্ঠী' কর্মিসভার সঙ্গে আলোচনা না করে একটা বদলির নির্দেশ দেওয়ার 'অভিযোগে';

এবং তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবিতে উপাচার্যকে তালাবন্দি করে রাখা হল। বস্তুতই সেদিন যখন কর্মিসভার সদস্যরা তাদের স্বঘোষিত নেতার (অবসরগ্রহণ পর্যন্ত) নেতৃত্বে আমার ঘরে হানা দিল, তখন তাদের সেই নেতা গলা চড়িয়ে উপাচার্যের কাছে কৈফিয়ত চান, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও সহকর্মীকে বদলি করার ঔদ্ধত্য উপাচার্য দেখান কী করে! তাদের বীরত্ব অবশ্য ঘুচে গেল অচিরেই যখন আশ্রমে শান্তি-স্থিতির সপক্ষে থাকা বেশকিছু অন্য সহকর্মী আমার ঘরে এসে পৌঁছলেন। যারা 'স্বঘোষিত রাবীন্দ্রক'— তাদেরই সবার আগে চম্পট দিতে দেখলাম আমরা সিসিটিভির ফুটেজে; যাতে প্রমাণ হয় আসলে এরা কতটা দুর্বল! তাদের ছিয়াশি জনকে আমরা কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরালাম এবং তারমধ্যে বেশিরভাগ নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করল শুধু তিনজন দুষ্কর্মা বাদে। আমরাও ক্ষমাপ্রার্থীদের আরেকবার সুযোগ দিলাম। উপাচার্যকে তাঁর কর্তব্যকর্মে বাধা দেওয়া এবং তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখার অপরাধে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত কিনা তা এখন একটি উচ্চপর্যায়ের বিচারমূলক তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখছে। মজার ব্যাপার হল অবসরপর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়ে যাওয়া সেই স্বঘোষিত নেতা কৃতকর্মের দায় ঝেড়ে ফেলবার জন্য এখন একের পর এক পন্থা খুঁজে চলেছেন! ১৯ অক্টোবরের ওই ঘটনায় যারা তাঁর পোঁ ধরে আন্দোলনে এসেছিল তাদের কেরিয়ারের উপর নিশ্চয় একটা বিরূপ প্রভাব পড়েই গেল; অথচ নেতামশায় (যেহেতু অবসরপ্রাপ্ত) ঠিক করে নিয়েছেন তিনি তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে তদন্ত কমিটির কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি কিছুতেই হবেন না।

অতিপরিচিত ছক

বিশ্বভারতীর ভিতরের মানুষজনের সঙ্গে উপাচার্য (যিনি প্রায় অবধারিতভাবে একজন বাইরের মানুষই হয়ে থাকেন)-এর সম্পর্কের একটা বিশেষ ধরনের রসায়ন আছে। যদি প্রশাসন নির্বিকারভাবে ওই 'বকলমা প্রশাসক'-দের দাবিমতো সবকিছু মঞ্জুর করে তাহলে ক্যাম্পাসে শান্তি বজায় থাকবে এবং উপাচার্য তাঁদের 'সহায়ক' হিসেবে খাতির-টাতির পাবেন। কিন্তু একবার যদি প্রশাসন আইন বা বিধির প্রশ্ন তোলে, এবং সেই মোতাবেক কোনটা করণীয় কোনটা অকরণীয় নির্ধারণ করে নিতে থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে চিড় ধরবেই। পরিস্থিতি খারাপতর হয় যখন অন্যায্য দাবি মানা যায় না বলেই সেগুলো খারিজ করতে হয়; আর তখনই আন্দোলনকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে উপাচার্য হয়ে যান দুশমন আর অপকর্মারা হাতে-হাত রেখে তখনই গড়ে তোলে 'উপাচার্য তাড়াও' মোর্চা; যেহেতু তিনি তাঁদের ধান্দাবাজির পথে মূর্তিমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই কথাগুলোর সত্যতা বিশ্বভারতীর ইতিহাস থেকেই প্রতিপন্ন হয়। বিশ্বভারতীর ভোগান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হল সরকারি বিধি ভেঙে কাজ করার গুরুতর অভিযোগ; যা অডিট রিপোর্টে স্পষ্ট এবং এখন আমরা যা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তাছাড়া নিকট-অতীতে একজন স্থায়ী প্রাক্তন উপাচার্যের পদচ্যুতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা অস্থির বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়েছিল। যথার্থ আইনসংগত অভিভাবকের অভাবে কোনও জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি সেইসময়, কারণ তেমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আইনগত ক্ষমতাই তখন কারোর ছিল না। ফলে একটা-দুটো গোষ্ঠীর কাছে ওইসময় বিশ্ববিদ্যালয়টা হয়ে উঠেছিল

জায়গিরদারির জায়গা! পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠল যেহেতু সেইসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা সবকিছুতে নির্বিকার থেকে যাওয়াটাই উচিত পথ মনে করলেন! এটা খুবই অমর্যাদাকর ব্যাপার যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের সামনে তার আধিকারিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে কিন্তু পুলিশের কাছে তবু একটা অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের হচ্ছে না সেই মজ্জাগত ভয়ে— পাছে দুষ্কৃতীরা প্রত্যাঘাত করে! অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন পরিচালনা করাই ছিল তাঁদের কাজ। এইসব দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালমন্দের শরিক কোনও পক্ষের মধ্যেই তেমন প্রত্যাশিত প্রতিবাদী স্বর কোনওদিনই শোনা যায়নি; কিন্তু সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে ঘটনাগুলো সাধারণ মানুষের কাছে বেশ মুখরোচক খবর হয়ে উঠেছিল! যখন আমি সুযোগ পেলাম তখনই প্রশ্নগুলো তুললাম, এবং বোঝা গেল আমার অনুমান যথার্থ; বিশ্বভারতীর লোকজন এইসব ঘটনায় উদাসীন ভাব করে থাকতেন তার কারণ প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা কেউ 'আপন' বলেই মনে করতে পারেননি। বিশ্বভারতীকে যাঁরা তাঁদের সাম্রাজ্য বলে মনে করতেন তেমন কিছু সহকর্মীর প্রতারণার শিকার হয়েছিলাম আমি নিজেও, ২০১৮ সালে এখানে যোগ দেওয়ার পর। অন্য অধ্যাপক সহকর্মীদের সামনে আমার 'পূর্বিতা' আবাসনে, কিংবা আমার অফিসে লাঞ্ছনার ঘটনার কিছু কিছু উল্লেখ আমি এই বার্তালাপে আগেই করেছি। এসব আর কিছুই নয়, এ হল আমার কিছু শিক্ষাকর্মী বন্ধুর প্রশাসনের উপর পেশি প্রদর্শন করে অপরিসীম নিয়ন্ত্রণ (চলতি কথায় যাকে বলে 'দাদাগিরি'!) কায়েম রাখার কৌশল। আমার এখন বলতে ভাল লাগছে যে সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানকে অন্তর থেকে খুব ভালবাসেন তাঁরা জোটবদ্ধ হতেই দুষ্কর্মারা বুঝতে পারে 'জোর যার মুলুক তার' নীতি আর খাটবে না, বা গায়ের জোরে প্রতিবাদীদের মুখবন্ধ করেও আর রাখা যাবে না। আমার বলতে আরও ভাল লাগছে যে ক্যাম্পাসে 'দুষ্কর্ম-শুদ্ধিকরণ'-এর কাজে উৎসাহীদের সংখ্যা প্রতিদিন বেশ দ্রুত বেড়ে চলেছে; যার থেকে প্রতিপন্ন হয় বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়নি এখনও।

আরও একটা অতিপরিচিত চেনা ছক হল: বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, ছাত্র বা স্বার্থকেন্দ্রিক স্থানীয় ব্যবসায়ী— বিশ্বভারতীতে করেকম্মে খাওয়া যেধরনের মানুষই হন;— তাঁদের দাবিমতো সুবিধা-আদায় না হলে তাঁরা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা কোনও মান্য ব্যক্তির কাছে চিঠি লিখে বসেন এই ভেবে যে তাঁরা দাবিদারদের নিয়ম-বহির্ভূত দাবি-দাওয়াও বিশ্বভারতী প্রশাসনকে মেনে নিতে বাধ্য করবেন। এটা ঠিক যে বিশ্বভারতীর কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংগতির অভাব আছে যা দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। আমার সহকর্মীদের কাছে উপর্যুপরি আবেদন সত্ত্বেও আমাদের স্বেচ্ছাদানে গড়ে ওঠা কোনও স্থায়ী আমানত(করপাস ফান্ড) নেই, যা প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই থাকে। সম্প্রতি স্টেট ব্যাংকে আমরা একটা করপাস ফান্ডের খাতা খুলেছি এবং তাতে স্বেচ্ছাদানের জন্য ওয়েবসাইটে সবাইকে অনুরোধও করেছি। দেখা যাক তা কতটা ভরে ওঠে! সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে আমরা আরেকটা পরিকল্পনা করেছি যাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদেয় ফিজ বা অন্যান্য টাকা দিতে তাঁরা অপারগ হলে ওই ফান্ড থেকে টাকাটা দিয়ে দেওয়া যায়। আমি অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশ্বভারতীর অন্যান্য স্বজনবন্ধুদের কাছে আবেদন করি, আপনাদের ইচ্ছামতো স্বেচ্ছাদানে বিশ্বভারতীর এই মহতী উদ্যোগটিকে সবাই মিলে সার্থক করে তুলুন, এই উদ্যোগে আপনারা সবাই সামিল হোন।

প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা অন্য মান্যবর ব্যক্তিদের কথায় কথায় চিঠি লেখেন যাঁরা— আমার সেই সহকর্মীদের কাছেও বিনীত নিবেদন, তাঁরাও যেন বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে আসেন। আমি সেইসব সহকর্মীকে বিশেষভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাব যাঁরা ভারতের অভিভাবকহীন নিঃসহায় মানুষের দুঃখকষ্টের স্বঘোষিত জিম্মেদারি নিয়ে শুধু ভাষণ দিয়ে গেছেন এতকাল। যাঁরা অতীত থেকে শিক্ষা নিতে অনীহা প্রকাশ করেন, ইতিহাস হয়তো তাঁদের ক্ষমা করে না। এইসব অধ্যাপক বন্ধুদের সময়, (দুঃস্থ মানুষের জন্য) উদ্বেগ এবং উদ্ভাবনী শক্তির সদ্ব্যবহার হত; যদি অভিযোগের চিঠি লিখে লিখে মূল্যবান কর্মশক্তির অপচয় না করে তাঁরা তাঁদের সহকর্মী ও প্রশাসনের সঙ্গে হাতে-হাত রেখে সরাসরি বিশ্বভারতীর উন্নতির জন্য কাজ করে যেতেন!

সামনের দিকে এগিয়ে

আমার সপ্তম বার্তালাপের উত্তরে সহকর্মীদের কাছ থেকে আমি বেশ কিছু সৎ পরামর্শ পেয়েছি। তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে তাঁরা আমার উত্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন বলে আমি তাঁদের তারিফ করব। এটা মেনে নিতেই হবে যে অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রগুলিসহ আমাদের বিশ্বভারতীর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে; এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই আমাদের সেগুলি ঠিক করে নিতে হবে। আমাদের অধ্যাপক সহকর্মীরা(বিশেষ করে শিক্ষাভবনের সহকর্মীরা) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত অপ্রতুলতার দিকটি চিহ্নিত করেছেন যা উচ্চমানের প্রভাবক গবেষণাপত্র প্রস্তুতির পথে প্রতিবন্ধক; এবং স্বাভাবিকভাবেই যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে 'ন্যাক' এবং এনআইআরএফ র‍্যাংকিং-এ। বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে অর্থবরাদ্দ যেহেতু সংকুচিত হচ্ছে সেইজন্য এর একমাত্র বিকল্প হতে পারে গবেষণার জন্য কর্পোরেট হাউসসহ বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে অর্থের জোগান কীভাবে বাড়ানো যায় তা খতিয়ে দেখা। সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য কর্পোরেট হাউসের যে নির্দিষ্ট অর্থরাশি থাকে, সেই অর্থই হতে পারে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজের উৎসমূল। এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলি যৌথভাবে খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে আমাদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন বাবদ এককালীন একটা অর্থবরাদ্দের জন্য আমি নিজে নিরলসভাবে আমাদের মাননীয় আচার্যের কাছে দরবার করে চলেছি। আশাকরি, আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে, এবং শিক্ষাভবনের সহকর্মীদের সমস্যাগুলির সুরাহা হবে। অন্য যে-দিকটা আমাদের সহকর্মীদের প্রত্যুত্তরে জানতে পেরেছি তা হল ফাইল চালাচালির ক্ষেত্রে 'আমলাতান্ত্রিক জটিলতা'-জনিত বিলম্ব। এটাও একটা সংগত অভিযোগ এবং অবিলম্বে এর প্রতিবিধান হওয়া উচিত। তবে প্রশাসন এব্যাপারে খানিকটা অসহায় কারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে মন্ত্রকের কড়া নজরদারির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যেহেতু আগে ধারাবাহিকভাবে এখানে সরকারি নিয়মভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে। ঠিকই, ফাইলের ছাড়পত্র পেতে একটু সময় লাগে কারণ আর্থিক লেনদেন-সংক্রান্ত ফাইল হলে তাতে বিত্তাধিকারী এবং অভ্যন্তরীণ অডিট অফিসারের সবুজ-সংকেত থাকা অপরিহার্য, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-কর্মীরা জিএফআর-এর নিয়ম-কানুন সাংঘাতিকভাবে উল্লঙ্ঘন করেছেন এমন প্রভূত দৃষ্টান্ত এখানে আছে। উদাহরণ হিসেবে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে আমাদের একজন অধ্যাপক জিএফআর লঙ্ঘন করে একটি প্রোজেক্টে ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ

করেছেন! যদি আমাদের সহকর্মীরাই এইজাতীয় অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাহলে আমাদের আর কী-ই বা করার থাকে? 'ক্যাগ' কিন্তু বলবে এরজন্য প্রশাসনই দায়ী! এইরকম অসংখ্য আর্থিক দুর্নীতির দৃষ্টান্ত আছে যা ঘটিয়েছে আমাদের সহকর্মীরাই। সম্প্রতি দেখলাম আমাদের একজন সহকর্মী একই বিল দুবার পেশ করেছে! প্রথমটি ২০২০-র ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে আর দ্বিতীয়টি এই সেদিন— জুলাইয়ের শেষদিকে। এখন আমরা যদি কঠোরভাবে এইসব আর্থিক দাবির বিল খতিয়ে না দেখতাম তাহলে আমরাই ভুলের ফাঁদে পা দিতাম। আমাদেরই সত্যনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসভাযোগ্য হতে হবে। আমি নিজে আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে কোনও বিকল্প পন্থাও নেই। আমি সহকর্মীদের অনুরোধ করছি আপনারা আমার অফিসে এসে আমাদেরই সহকর্মীদের আর্থিক নয়ছয়ের ব্যাপারে অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদগুলি দেখে যান। এই অনিয়মগুলো শুধরে নিয়ে আমাদের এখন 'ক্যাগ'কে সন্তুষ্ট করতে হবে, তা নাহলে বিশ্ববিদ্যালয়কেই তার চড়া মূল্য দিতে হবে। যথেষ্ট লজ্জার বিষয় যে আমাদের সহকর্মীদেরই প্রশ্রয়মূলক দুষ্কর্মের কারণে একজন 'ভুতুড়ে কর্মী'র নামে এখানে টাকা তোলা হয়েছে নিয়মিত; যা এখন সর্বসমক্ষে খুল্লমখুল্লা হয়ে গেছে! বছরের পর বছর এটা ঘটতে দেওয়া হয়েছে এবং কয়েকমাস আগে বিষয়টি প্রশাসনের গোচরে আসার পর তার প্রতিবিধান করা হয়েছে। এরকম ৪৭টি আর্থিক অসংগতির ঘটনা আছে যা ২০২১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শুধরে নিতে না পারলে মঞ্জুরি আয়োগের নিয়মিত বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাবে।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় 'ন্যাক' মূল্যায়নের প্রস্তুতির কাজ চলছে। আমাদের সহকর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন বিশ্বভারতীর কাম্য র‍্যাংক সুনিশ্চিত করার জন্য। আমি বুঝতে পেরেছি গতবার বিশ্বভারতীর বি+ র‍্যাংক পাওয়ার পিছনে ছিল অংশত অভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাত। ন্যাক টিমের একজন সদস্যকে যখন বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে 'এটা অভিযোগ-প্রতিকার কমিটি নয়'; তখন এরকম ফলই তো হবে! বাণিজ্যিক স্বার্থে যে-সব বাইরের লোক বিশ্বভারতীকে ব্যবহার করে, সম্ভবত তাদের পরোক্ষ প্ররোচনায় আমাদের অনেক সহকর্মী এই জঘন্য কাজে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন ন্যাক মূল্যায়নে বিশ্বভারতী খারাপ ফল করলে শুধু যে বিশ্বভারতীর উপর স্থায়ী আর্থিক ও উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা নেমে আসবে তা-ই নয়; যে মহতী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িয়ে আছে তার ভাবমূর্তিও কালিমালিপ্ত হবে। এ হল সেই আত্মঘাতী 'হারা-কিরি' খেলা, যা খেলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আনন্দ পান! এ যেন সেই গল্পকথার 'সোনার ডিমপাড়া রাজহাঁস'-এর গল্প, যাকে নির্বোধেরা খুন করে ফেলে! আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণে রেখে আমি আমার সব সহকর্মী এবং বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত সব্বাইকে অনুরোধ করছি, আসুন, ন্যাক মূল্যায়নের এই সময়ে আমরা সবাই একজোট হয়ে কাজ করি। কেননা ন্যাক-এ ভাল মান অর্জন করতে পারলে ভাল হবে আমাদের সবার। আমাদের সহকর্মীদের বৌদ্ধিক সম্পদ এবং কঠোর শ্রম একত্রিত হলে বিশ্বভারতীর খ্যাতি ও পরিচিতির অনুপাতে 'ন্যাক'-এ উচ্চমান পাওয়া মোটেই অসম্ভব মনে হয় না।

আমি খুব আশাবাদী যে আমাদের সবার মেধা একত্রিত হলে যে-সব সমস্যায় এতকাল বিশ্বভারতী আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তা সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করা যাবেই। আমি নিশ্চিত যে

সততা, সত্যনিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম আমাদের লক্ষ্যপূরণে সহায়ক হবে। এই মূল্যবোধগুলির শক্তি কতখানি তার উদাহরণ হিসেবে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলব। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে— বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে পাতাল রেল, বাস সার্ভিস ইত্যাদি খুব ভালভাবেই চলে। এটা খুব আশ্চর্যের কথা যে এইসব গণপরিবহন ব্যবস্থায় যাত্রীদের ভাড়া আদায় করার জন্য কোনও লোক প্রায় থাকেই না। যারা এইসব যানবাহনে যাতায়াত করে তাদের উঠতেও বাধা দেওয়া হয় না, কিংবা টিকিট বা পাস দেখতেও চাওয়া হয় না। কোনও কোনও মাটির তলার রেলগাড়িতে এমনকি চালকও থাকে না! যাত্রীদের টিকিট তদারকির কেউ থাকে না বলে সেসব দেশের গণপরিবহন ব্যবস্থা কিন্তু অর্থাভাবে ভেঙে পড়েনি বা অস্তিত্বরক্ষার সংকটে পড়েনি। এই ব্যবস্থা চলতে পারছে ওইদেশগুলির নাগরিকদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সত্যনিষ্ঠার কারণে। তারা কখনও প্রতারণাও করে না, বা গণপরিবহনকে ফাঁকি দেওয়ার কথা মনেও আনে না। এরথেকে আমরা একটা শিক্ষা নিতে পারি। জনগণের জন্য জনস্বাচ্ছন্দ্যের বিপুল আয়োজন সন্দেহের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে চলে না, এক্ষেত্রে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণপরিবহনের যাত্রীদের আচরণের সুষমার উপর। সে সুষমার ভিত্তি হল বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সত্যনিষ্ঠা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী স্থাপনার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শেরের ভিত্তিই আসলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সব প্রতিষ্ঠানেই কিছু কিছু দুষ্ট মানুষ থাকে, তাদের সহজেই আগাছার মতো উপড়ে ফেলা যায়। আমার এই প্রায় দুবছরের স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতায় এই প্রত্যয় জন্মেছে যে আমার বেশিরভাগ সহকর্মী এবং বিশ্বভারতীর ভালমন্দের শরিকবন্ধুরা প্রতিষ্ঠানের ভালর জন্য কাজ করে যেতে উৎসাহী। আমাদের অনেকেরই গুরুদেবের বিশ্বভারতীতে কাজ করা একুশ শতকের জাতিগঠনের একটি প্রকল্পে যোগদানের সুযোগ বলেই মনে হয়। সচরাচর বিরল এমন অনেককিছু এখানে আছে যা অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই মেলে না। আমাদের মহান খ্যাতকীর্তি পূর্বসূরিরা বহু মেহনতে একে সর্বাত্মক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে তেমনভাবেই গড়ে তুলেছিলেন।

বিশ্বভারতীর অনন্যতা

একটা প্রতিষ্ঠানের কিছু শক্তিমত্তার দিক থাকে কিছু দুর্বলতার। যেহেতু বিশ্বভারতী তার যাত্রা শুরুই করেছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতা এবং জ্ঞানের মুক্তিসাধনার মহান ঐতিহ্য থেকে, সেইজন্য যাঁরা এখানে কর্মসূত্রে যুক্ত হন; এবং যাঁরা এই পরিমণ্ডলের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যথার্থ রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠেছেন তাঁরা সবাই ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছেন। বিশ্বভারতী একটা গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয় নয়; এ হল শ্রেণি, জাতপাত, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বজনহিতায় বিশেষ একটি মূল্যচেতনা সঞ্চার করা ভাবাদর্শের নাম। গুরুদেব তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন একটি সর্বসংযুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উপযুক্ত মানসিকতা রচনার জন্য। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে ‘আমরা অপেক্ষা করে আছি সেই সময়ের জন্য যখন যুগের আত্মা সম্পূর্ণ মানবসত্যে পুনর্জন্ম নেবে এবং মানুষে-মানুষে

সম্পর্ক রূপ পাবে অখণ্ড মানব-ঐক্যের মধ্যে।'(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দ্য ভয়েস অফ হিউম্যানিটি')। তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমিতে ছিল মানুষের বিশ্বগত হয়ে ওঠবার চেতনা:

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

আমি এই বার্তালাপে ইতি টানব একটি একান্ত অনুরোধ জানিয়ে। আপনারা নিরাপদ থাকুন, সতর্ক থাকুন। কোভিড-১৯-এর মারণ ক্ষমতা কমছে বলে তো মনে হচ্ছে না। দয়া করে ডাক্তারদের নির্দেশগুলি অনুসরণ করে চলুন। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিকভাবে কাছাকাছি থাকুন সবাই। ভাইরাসকে ঠেকিয়ে রাখতে এখন এ-ই আমাদের করণীয়।

আস্থা রাখুন।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
১৫/০৮/২০২০
বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

•বিশ্বভারতী•
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India